অণ বসুর কবিতা

সুমিতা চক্রবর্তী

বিংশ শতাব্দীর শেষ দশকের প্রায় শেষ বিন্দুতে দাঁড়িয়ে বাংলা কবিতার সাম্প্রতিকতম গতি প্রকৃতির দিকে তাকালে মনে হতে পারে কবিরা এখন মঞ্চ ও পাদপ্রদীপ অধিকার করতে খুবই উদগ্রীব। এবং তাঁদের সেই মঞ্চ ও পাদপ্রদীপ যোগান দিতে প্রায় সমভাবে আগ্রহী সরকার সহ কোনো কোনো প্রতিষ্ঠান। কবিতার সভা হয়, কবিতা পাঠের আসর হয়, কবিতার উৎসব হয়, কবিদের পুরস্কার দেওয়া হয়, সরকারী কবিতা উৎসবে কবিতা পাঠ করে করিয়া ২০০ থেকে ২০০০ পর্যন্ত উপার্জন করে থাকেন।

আপত্তি করি না কোনো কিছুতেই, বাঙালী সমাজ প্রতিষ্ঠানিক ভাবে কবিতা - মনস্ক হয়ে উঠছে—এ তো সুখেরই কথা। কিন্তু সমস্যাটা আসলে সেটাই যা আমাদের সমগ্র ভারতরাষ্ট্রের সমস্যা। জনসংখ্যা বড় বেশী। কবির সংখ্যা সংখ্যাতীত, সম্ভব নয় বছরে ২- ৩টির বেশী পুরস্কার দেওয়া। আর কবিতা উৎসবেও কবিদের যতজন ডাক পাবেন তারা কোটি ভগ্নাংশের সমতুল। কাজেই ডাক না-পাওয়া এবং পুরস্কার না-পাওয়া কবিরা ক্রুদ্ধ হতে থাকেন, প্রতিবাদী কবিতা সভা আহ্বান করেন, নিজেরাই সংগঠন তৈরি করে কবিদের সংবর্ধনা দেন, কখনও পুরস্কারও থাকে।

এক কথায় বলা যায়, কবিরা সবাই দৃষ্টি আকর্ষণ করবার জন্যই বড় বেশী তৎপর হয়ে উঠেছেন। এই বাতাবরণে যদি এমন একজনের রচনা সংকলন হাতে আসে যিনি ১৯৬২ সাল থেকে এখনও পযন্ত কবিতা লিখেছেন অল্প হলেও নিয়মিত এবং কখনও সন্ধান করেননি মঞ্চ অথবা পাদপ্রদীপ, সন্তর্পণে পাশ কাটিয়ে গেছেন সবরকম প্রতিষ্ঠানের আলোকসম্পাতব। তখন ঘটনাটি — কেবল এইঘটনাটিই মন স্পর্শ করে। অণ বসু কবির আত্মস্থ আত্মমর্যাদার অচঞ্চলতার দিকে আমাদের দৃষ্টি ফিরিয়ে দিয়েছেন —— এ জন্য তাঁকে কৃতজ্ঞতা।

সাময়িক পত্রে ইতস্তত তাঁর কবিতা পড়ে থাকব কিন্তু যিনি ১৯৬২ সাল থেকে কবিতা লিখলেও ১৯৭৯ সালে একটি মাত্র কবিতার বই ছাড়া আর কোনো কবিতা গ্রন্থ প্রকাশ করেননি —তাঁর কবিতা সম্পর্কে কোনও নির্দিষ্ট ধারণা যে মনের মধ্যে গাঁথা ছিল না তা খুব আশ্চর্য নয়, তাই নির্বাচিত কবিতা শিরোনামে যখন অণ বসুর একটি নয়- ফর্মার কবিতা সংকলন হাতে এল তখন একটু বিস্মিতই হতে হল কবিতাগুলির শিল্প -পরিণত রূপাবয়ব প্রত্যক্ষকরে। এই কবিকে তুলে ধরবার জন্য অফবিট পাবলিশিং -এরও সাধুবাদ প্রাপ্য।

শিক্ষিত মনের মেধাবি মননের কবিতা। তার অর্থ এই নয় যে অনুভবের প্রগাঢ়তা বা হৃদয়াবেগের তরঙ্গ - উচ্ছ্বাস বা উপলব্ধির আত্মগ্নতা তাঁর কবিতায় সংবেদিত হবে না। আবেগ ও মনন কোনো বিচ্ছিন্ন দ্বীপ নয়। যাকে আবেগ বলি তাও মস্তিষ্কের ক্রিয়া। মনন ও আবেগের মধ্যে যে অস্পষ্ট পার্থক্যটুকু করা হয় তাতে কেবল এটুকুই বোঝার যে মনন হল শিক্ষিত মনের বৈদগ্ধ্য - সমৃদ্ধ অনুভবের উদ্ভবের, আর, আবেগ হল মৌন অনুভুতির তাৎক্ষণিক প্রবলতা। কবিতায় কিন্তু কখনই এ-দুটি বিচ্ছিন্নভাবে আসে না। কবি কখন অশিক্ষিত হন না। নিরক্ষরকবিও অশিক্ষিত নন। ঘিরে থাকা বিশ্ব - জগৎ -কে মনের মধ্যে গ্রহণ করবার এবং এই বিশ্ব-জগতের সঙ্গে মনের সংঘাতকে প্রতি মুহূর্তে উপলব্ধি করবার ক্ষমতাকেই বলব মনন- শক্তি ও প্রকৃত শিক্ষা। এই শিক্ষা অর্জন না করলেকোনো মানুষ কবি হয়ে উঠতে পারে না। যে আবেগের প্রাবল্যে মানুষ কেঁদে ভাসায়, বুক চাপড়ায়, নিজেকে খানখান করে বিদীর্ণ করে দেয়—সেই আবেগে কবিতা সৃষ্টি হবে না। সব আবেগই মনের মধ্যে সঞ্চিত হবে মননের কোষে - কোষে, তারপর এক নিবিড় - পূর্ণ মুহূর্তে কবি তুলে নেবেন কলম। করিতার জন্ম হবে সেই মনন—সঞ্জাত আবেগে। তাই কবিতায় মননের উদ্ভাস ও ঔজ্জ্বল্যকে যারা অপ্রয়োজীয় বা অতিরিত্ত বলে মনে করেন তাঁদের কবিতাইযে সর্বদা উত্তীর্ণ হবে এমন নয়। কুমুদরঞ্জন বা কালিদাস রায়ের চেয়ে জীবনানন্দ দাশের কবিতা অনেক বেশি মনন-জটিল। তাঁর কবিতায় কালোত্তরণের শত্তিও অনেক বেশী — এই মননের জোরেই। আবেগে ও মনন পরস্পরের বিরোধী নয়, পরিপূরক। এই মনন সমৃদ্ধ এবং পরিশ্রুত হয় শিক্ষায়, জ্ঞানে, বৈদগ্ধ্যে। তা কখনও কবিতার ক্ষতিসাধন করে না। এজরা পাউন্ড বা সুধীন্দ্রনাথ দত্তের মতো কারও কারও কবিতায় এই মনন-জাত উল্লেখ -সম্ভার কিছু বেশী। স্বল্প শিক্ষিত পাঠককে তা ব্যাহত করে। তাই স্বল্প শিক্ষিত পাঠকেরা আপত্তি জানান। কিন্তু স্বল্প শিক্ষিতের দ্বারা কেন চালিত হবেন সংস্কৃতির প্রতিনিধি ! তাঁর দায় যদি কিছু থাকে — সে তো সাংস্কৃতিকতাকে সমৃদ্ধতর করবার দায়।

অণ বসু মননশীলতার কবি। কবিতার বিষয় বয়নে, কবিতার অভিব্যত্তিতে এবং করিতার শিল্পরূপ নির্মাণে এই মননশীলতার উৎসারণ এবং পরিমার্জনা লক্ষণীয়। তাঁর পঠনবৃত্তে আছে বেদ থেকে শু করে কমলকুমার ও বিনয় মজুমদারের রচনা। তাঁর মনন বৃত্তে আছে সমগ্র ভারতের ভূপ্রকৃতি, দর্শন এবং অর্থনীতির পরিমন্ডল। তাই তাঁর কবিতার বিষয় হতে পারে দশমহাবিদ্যা কিংবা শিলালেখ কিংবা শূন্যপুরাণ, আবার তাঁর কবিতার বিষয় হতে পারে হস্তিনাপুর, টোটোপাড়া, সায়েন্স সিটি অথবা শিল্পায়ন ঃ ভারতবর্ষ, ১৯৯৫।

কাব্য বিষয়কে অবলম্বন করে যে অনুভব - লোক গড়ে ওঠে তাঁর কবি চিত্তে তার শৈল্পিক অভিব্যক্তিতে কবি অকাতরে গ্রহণ করেন সর্বদেশীয় সাংস্কৃতিক পরম্পরা থেকে গৃহীত উপাদান। একদা এই অভ্যাসের জন্য কবি বিষ্ণু দে এবং সুধীন্দ্রনাথ দত্ত ছিলেন একই সঙ্গে বন্দিত ও সমালোচিত। পরবর্তীকালে রমেন্দ্রকুমার আচার্যচৌধুরীর কবিতায় এই ধার লক্ষ করেছি। ষাটের কবিরা এই ধারা আবার ফিরিয়ে এনেছিলেন ৫০ -এর কবিদের পরে । পঞ্চাশের কবিরা এ - জাতীয় উল্লেখের দুরূহতা মোটের উপর পরিহার করতেই ভালোবাসতেন। চল্লিশের কবিরা অবশ্য আন্তর্জাতিক পৃথিবী থেকে গ্রহণ করেছিলেন অনেক উপাদান তবে প্রধানত তা ছিল রাজনৈতিক এবং বিপ্লবপন্থী সক্রিয়তার অঙ্গীভূত। সমকালীন বিশ্ব রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট থেকেই পাওয়া যেত সূত্র-সন্ধান। ততটা সহজে সন্ধানের পথওপাওয়া যাবে না বিষ্ণু দের বা রমেন্দ্রকুমার আচার্যচৌধুরী কবিতায়। ষাটের দশকের কোনো কোনো কবি পুরনো অভ্যাসে আবার কিছুটা ফিরে গিয়েছিলেন। অণ বসুর কবিতা তারই সুন্দর দৃষ্টান্ত। আমরা যথেচ্ছ কয়েকটি উদাহরণ তুলে দিতে পারি ঃ

উদাহরণ ১.

শব্দের ভিতরে শব্দ, বিয়াত্রিচে, ময়ূরপেখম
আমি তার পাশে আজ তামসিক ধবনিবন্দী ঃ
জেনেছি বিাদময়
এ - জীবন লীলালাস্য নয়—

বিয়াত্রিচে শব্দটির ব্যবহার এখানে কেন? কবিতাটির নাম শব্দ ঃ ১। এজন্যই কি বিয়াত্রিচে শব্দের প্রয়োগে, যে, কবি বিচিত্র ধরনের শব্দকে বসাতে চাইছেন পাশাপাশি ? যেমন -- বিয়াত্রিচে আর ময়ুরপেখম ?ছোট কবিতা। কবিতার শেষে কবি লেখেন — শব্দ এই পৃথিবীর /রক্ত / মাংস / হাড় প্রশ্ন জাগে আবারও দান্তে -র সেই দিব্যমিলন গাথার অভিমুখীনতা, আমরা জানি স্বর্গের দিকে, রক্ত - মাংস - হাড়ের দিকে নয়। তাহলে কেন এই বিয়াত্রিচে শব্দটি ? হয়তো খুব অভিনব কোন অর্থে নয়। সেই পরম্পরাগত অর্থেই এসেছে বিয়াত্রিচে, যে দিব্যলোকে হাত ধরে নিয়ে গিয়েছিল কবিকে। দান্তে -র কালে দিব্যলোকের যে অভিব্যঞ্জনা কবির হৃদয়কে পুর্ণ করে রাখতো, আজ বস্তু - পৃথিবীকেই মহিমাময় জেনে পৃথিবীর রক্ত - মাংস হাড়েই সেই বিয়াত্রিচে -কে কাছে পাবার চরিতার্থতায় পৌঁছে যেতে পারেন কবি। সমগ্র কবিতাটি শব্দকে লক্ষ্য করে রচিত। সেই পরম ব্রহ্ম শব্দ। দান্তে-র দিব্যমিলন গাথা আর আজকের বাঙালী কবির রচনা ঐ একই শব্দ অনুষঙ্গ উদ্ভাবিত হয়।

উদাহরন ২.

যোষিৎ - চোখ - ছোঁয়া
দু - চোখেই ডাকে আয়
আকিরা কুরোশোয়া
আলোয় ভেসে যায়
আলো কি অবলীন
শুধুই ভেসে যায়
আলো কি প্রতিদিন
সত্যজিৎ রায়
কামিনীকাঞ্চন
ছুঁয়ে সে ডাকে আয়
প্রজ্ঞানুরঞ্জন
শরীর ভেসে যায়
এ - বুক জুড়ে সুখ
আ- মরি লজ্জায়
সোনার ভল্লুক
ওরা- যে চেটে খায়

আপাত দৃষ্টিতে কবিতাটির অর্থ বুঝে নেওয়া কঠিন নয়। একটি প্রতিষ্ঠান বিরোধী কবিতা। কিন্তু কবিতাটি খুব সাহসের সঙ্গে আধুনিক সংস্কৃতি চর্চার জটিল একটি বিন্দুকে স্পর্শ করেছে। সিনেমা। নিশ্চয়ই সংস্কৃতি চর্চার এক অতীব সম্পন্ন উপাদান। অভিনব এক যৌগ - শিল্প । একটি দেশের আধুনিক -শিল্প- চর্চার মানকে আন্তর্জাতিক স্তরে তুলে নিয়ে যেতে পারেন এবং মর্যাদা আদয় করে নিতে পারেন একজন প্রথম শ্রেণীর চলচ্চিত্র পরিচালক। যেমন করেছেন জাপানের আকিরা কুরোশোয়া এবং ভারতের সত্যজিৎ রায়। তবু প্রশ্ন জাগে এই শিল্প - চর্চা, বহু অর্থলগ্নীকৃত এই সৎ চলচ্চিত্র প্রযোজকের জন্য নির্ভর করবে অর্থবান ব্যবসায়ী অথবা সরকারী প্রতিষ্ঠানের উপর। চলচ্চিত্র নির্মিত হবে হয় সাধারন দর্শকের চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে (টাকা উঠে আসার প্রত্যাশায়) অথবা লক্ষ্য হবে আন্তর্জাতিকচলচ্চিত্র উৎসবের পুরস্কার — সোনার ভল্লুক ওরা - যে চেখে খায়। সাধারণ দর্শক ?তাদের বর্ণনার কবি লেখেন যোষিৎ -চোখ - ছোঁয়া এবং কামিনী- কাঞ্চন ছুঁয়ে সে ডাকে আয়। আসলে এই ধরনের শিল্পচর্চায় প্রকৃতই কোনো প্রতিষ্ঠান বলয় - বহির্ভূত সমগ্র -চি - বিস্তার সম্ভব হয় না। তো শেষ পর্যন্ত বাঁধা থাকে প্রতিষ্ঠানের দুয়ার - সমুখে। এই কথাটি দিয়েই প্রবন্ধটি শু করা গিয়েছিল -- কবিতা আর প্রতিষ্ঠানিকতার অচ্ছেদ্যবন্ধন -- আছে

উদাহরণ ৩.

কবিতাটির নাম প্রাচ্য - প্রজ্ঞা। ভূ - প্রকৃতির এক পূর্ণতার পরিমন্ডল রচিত হয়েছে প্রথম কয়েকটি পংক্তিতে। বৃক্ষ - কোটর, জলের মেদুর - করোটি, সবুজ ফল আর উজ্জ্বল মঞ্জরীতে পূর্ণ অমৃতময় স্থিতি । এই জীবন - দৃষ্টি প্রাচীন ভারতীয় চিন্তায় লক্ষ্য করা যায়। যদিও ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির পরিসীমার মধ্যেই তা আবদ্ধ ছিল। তবু মোটের উপর বালা যায় যে শিক্ষিত শ্রেণীর যে সংস্কৃতিতে পৃথিবীর সর্বত্রই একটি দেশের মূল সংস্কৃতি বলে ধরে নেওয়া হয়, ভারতের মতো বহু দলিত - শ্রেণী অধ্যুষিত দেশের ক্ষেত্রেও যার ব্যতিক্রম নেই, পরম্পরাসিদ্ধ অর্থে তাকেই প্রাচ্য - প্রজ্ঞা বলে এখানে ধরে নেওয়া হয়েছে।

কিন্তু কবিতাটির সাংস্কৃতিক ঔজ্জ্বল্যের দীপ্তি বিভাসিত হয়ে উঠেছে শেষ কয়েক পংক্তিতে—

‘দ’
প্রিয় হে সবুজ ফল, তুমি তার হাতে দুলে দিও

রম্যজল ঃ
দত্ত
দয়ধবম্
দাম্যত
শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ
এই পংক্তিগুলি পড়ামাত্রই পাঠকের সামনে ভেসে উঠবে এলিয়ট -এর পোড়োজমি কবিতাগুচ্ছের শেষ কবিতার শেষ অংশ যেখানে ঠিক এইভাবেই তিনবার উচ্চারিত হয়েছে দ, দ, এবং দ। ঠিক এইভাবেই ব্যবহৃত হয়েছে দত, দয়ধবম্ এবং দাম্যত এই তিনটি শব্দ। সেখানে এগুলির অর্থেরও অনুষঙ্গ আছে এবং এলিয়টও কবিতা শেষ করেছেন শান্তি, শান্তি, শান্তি উচ্চারণ করে। অণ বসুর লিখিত কবিতাংশটিতে রম্যজল শব্দটিও অভিনিবেশ- যোগ্য । এলিয়টের কবিতায় বালুকা ও প্রস্তরময় ভুমিতে প্রথমে বিন্দু - বিন্দু জল পড়ার শব্দ প্রাণের সঞ্চার ঘটিয়েছে। তারপরে এসেছে ঝড়। ঝড় কি বলে ?

ঝড় বলে —দান কর, দায়া কর, দমন (রিপু) কর। তবেই কালঝঞ্ঝা অন্তে আসবে শান্তি। এই কবিতা এলিয়ট - এর । অন বসু সেখান থেকেই তুলে নিয়েছেন অংশটি তাঁর প্রাচ্য- প্রজ্ঞা কবিতার জন্য। এলিয়টও সেই প্রাচ্য - প্রজ্ঞার স্পর্শে যুদ্ধ - বিধবস্ত ইউরোপের পোড়োজমিতে শান্তি - জল সন্ধান করেছিলেন। এভাবেই এলিয়ট সঞ্জীবিত হয়েছিলেন প্রাচ্যের ধ্যান - স্পর্শে । অণ বসুর কবিতাটি পুনঃসঞ্জীবিত হয় এলিয়টের উত্তরাধিকারের স্বীকরণে। একটি কবিতা যখন স্মরণে নিয়ে আসে আরও অনেক কবিতাকে, একটি কবিতা যখন উপনিষদ থেকে এলিয়ট পর্যন্ত বিপুল সংস্কৃতি - ধারাকে সাঙ্গীকৃত করতে পারে কয়েকটি পংক্তির মধ্যে তখন তাকেই বলবো প্রকৃত মনন — সঞ্জাত আবেগের কবিতা। এমন দৃষ্টান্ত আরও অনেক দেওয়া যায় কিন্তু মূল কথাটি তাতে একই থাকবে। তাহলে কবির অভিব্যক্তিতে অবিচ্ছিন্নভাবে মিশে গেছে বিশ্ব - সংস্কৃতির বিচিত্র উপাদান। এটি কবির নির্মাণ - পদ্ধতি সংক্রান্ত একটি প্রসঙ্গমাত্র।

কিন্তু অণ বসুর কবিতায় ভাব বস্তুটি কি ?কোথায় তাঁর মনোবৃত্তের কেন্দ্রবিন্দু ? এটি প্রথম প্রশ্ন আমাদের। জীবনকে জানা —নিজেকে জানার মধ্যে দিয়ে —প্রাচ্য দর্শনের এখানেই মনোনিবেশের মূল। একটু সরলীকরণ হবে তবু বলা যায় অণ বসুর ক্ষেত্রে ব্যাপারটা বোধহয় এরকমই। নিজের মধ্যে মগ্ন হয়ে অস্তিত্বের পরমার্থ সন্ধান। একটু বেশি দার্শনিক শোনাচ্ছে কিন্তু সত্যিই তাঁর কবিতায় গণমানসের প্রতিবিম্ব অনুভব করা গেল না প্রায় কোথাও। ব্যক্তিমানসে কেন্দ্রমূলে নিহিত এবং সংহত হয়ে জীবনের সৌন্দর্যকে, অস্তিত্বের গূঢ় রহস্যকে একানিকভাবে অনুভব করাই তাঁর কবিতায় মর্মবাণী। প্রথম পর্বে রচিত সরল বাচনের কবিতা — আঃ, কী সুন্দর এই বেঁচে থাকা যে বাণী ঘোষিত করে, সংকলনের অন্তে সংযোজিত ষড়ৈশ্বর্য পর্যায়ের কবিতাগুলিতেও প্রাচীন ভারতীয় বেদ, উপনিষদ, মহাকাব্য, পুরাণ ও ইতিহাস সংক্ষিত করে গড়ে তোলা ১০টি কবিতাতেও সেই একই অনুভবের বিচিত্র উদ্ভাস।

প্রাচ্য - দর্শন চিন্তায় আরাধ্য হিরন্ময় সত্ত্বা এবং দেহভান্ড নিহিত আত্মার সম্পূর্ণ জ্ঞানের মধ্যে এক বিচিত্র সেতু স্থাপিত হয়েছে। কখনও তারা বিচ্ছিন্ন কিন্তু এক হবার ব্যাকুলতায় উন্মুখ , কখনও তারা অভিন্ন কিন্তু লীলা - আস্বাদন - অভীস্পায় দুই অস্তিত্ব ধারণ করে। এই অনুভব সুগভীর, বহুবিচিত্র, রহস্যময় এথবং প্রকাশভঙ্গীর বহুস্তর বিন্যাসে আপাত রহস্যময় হলেও তার অন্তরস্থ মূলধারাটিকে অনুভব করতে পাঠকের খুব অসুবিধা হয় না।

আমাদের দুটি অংশ উদ্ধার করছি
অংশ ১. ষড়ধব (প্রথম উল্লাস), ৬ সংখ্যক কবিতা
৬. মহাশঙ্ক, আদিফুল
আকরের মধ্যে গাঢ় ব্যূঢ় - ব্যবচ্ছেদ
আমি পাঠ করি গ্রন্থ, শাস্ত্র চতুর্বেদ

উপনিষদের তনু সুবর্ণ - বলয়
এই চৈত্রে কোথা যাও উত্তর - মলয়

বলে দূরে বেজে উঠি ব্যথায় ব্যাকুল
পায়ে মহাশঙ্খ দোলে, হাতে আদিফুল

অংশ ২. সিদ্ধদ্বন্দ্ব (চতুর্থ উল্লাস), ২ সংখ্যক কবিতা
২. দিব্যতার মহাভার
হেঁতাল জানে কি তবে কাল মুখচ্ছবি
পরা - জ্ঞান থেকে জেগে ওঠেন জাহ্নবী

আমরা অই ধারাজলে পুণ্যস্নান সেরে
জেনেছি মানুষ কেন সবকিছু ছেড়ে

সিঁড়ি ভেঙে উঠতে চায় শেষ সোপানের
দিব্যতার মহাভর অপরা - জ্ঞানের....

ষড়ৈশ্বর্য পর্যায়ের এই সংহত কবিতাগুলিতে (সবগুলি কবিতাই ৬ পংক্তি বিশিষ্ট) বহু পঠন, মনন ও ধ্যানের সমন্বয় ঘটেছে কিন্তু মূল উপলব্ধিটি সম্ভবত গভীর ও ব্যাপ্ত হলেও বহুমুখীনতার অন্তরস্থ একমুখীনতার অন্তরস্থ একমুখীন ও নিবন্ধ- বিন্দু।

আমরা আগেই দেখাতে চেষ্টা করেছি কবির পাঠ বৃত্তের ব্যাপ্তি। বস্তুতই পাশ্চাত্য সাহিত্যের সমুদ্রবিহার থেকে শু করে বাংলা সাহিত্যের চর্যাগীতি থেকে বিনয় মজুমদার পর্যন্ত সাহিত্য সৃষ্টি সম্ভারে নিবিড় বিচরণ তাঁর যে কোনো পাঠককেই আকৃষ্ট ও মুগ্ধ করবে।

খুব স্বাভাবিকভাবেই তাঁর কবিতার প্রধান ছন্দ মিশ্রকলাবৃত্ত। যে ছন্দের তাল প্রাধান্যে এবং মন্দ্র গাম্ভীর্যে গভীর উপলব্ধি স্বয়ং প্রকাশ হয়ে উঠতে পারে। বহু নিদর্শন উদ্ধৃত করা যায় ২২ মাত্রায় পংক্তির সুন্দর উদাহরণ --- ধবান্তারি অথবা বীহিবন্দনার স্বপ্ন কবিতাটি ঃ
আকাশ - আবৃত তুমি অবর্ণ - আত্মার ফুল, অমল ভিখারি
ঋষিকুমারের খাদ্য নধরবাছুর, তুমি স্তব্ধ তিমিরারি।
আবার ঐ ছন্দেই পংক্তির পর্ব বিন্যাস এবং মিলের পরিকল্পনায় অপরূপ বৈচিত্র্য নিয়ে আসতে পারেন কবি। দৃষ্টান্ত পার্থিব কবিতাটি ঃ
স্মরণই চক্ষের মণি চেয়েছে সম্মান
সবিতৃ গেয়েছে পিতৃ- পুষের গান
মিশ্রকলাবৃত্তে অধিকাংশ কবিতা লেখা হলেও একদিকে গদ্যরীতি অন্যদিকে কলাবৃত্ত ছন্দের তরঙ্গায়নও অনায়াসে ধবনিত করে দিতে পারেন কবি। যে কোনো কবিতায় কলাবৃত্তের দুটি দৃষ্টান্ত দেখি ঃ নদীর অলীক কবিতায় ৬ মাত্রার কলাবৃত্তে সুরধবনি ---
অগ্নি - ঝরোখা
ছুঁয়ে কামপোকা
কাঁপে শিল্পের মতো খুব ভোরে
গড়ে ওঠে নদী
সভ্যতা যদি
শ্রমবিভাজন নদীর ভিতরে
বোধিবিহার কবিতায় কলাবৃত্ত ছন্দ এবং পর্বের কুশল বিন্যাসে ছন্দের এক নতুন রূপ ফুটেছে ।
মরমী ওই শমী বৃক্ষ বলে নমি প্রণমি পদতল
পলাশ বারোমাস এখানে ফোটে কাশ নয়ন শতদল
দলবৃত্ত ছন্দের প্রয়োগ অল্পই। এই ছন্দে অণ বসুর কবিতা ভাবনা খুব স্বাভাবিক উচ্চারণ পায় বলে মনে হয় না তবু দু-একটি দৃষ্টান্ত প্রতুল নয়, কৃষ্ণনগর জেল থেকে মা-কে দলবৃত্ত ছন্দের তিনটি বিভিন্ন তাল যেন বেজে ওঠে----
২.
রাত - বিরেতে কান্না শুনি
মড়া - ছেলের মায়ের গলা
নবীন আলোর সুরধুনী
নতুনতর পথের চলা
৩.
এবার নামবে সুদিন সূর্যরেখা
নামুক সুদিন রাজকীয়
এবার হৃদয় আমার পথ - বিপথে
ওড়াক বিজয় উত্তরীয়
৪.
অবশেষে এই মিনতি মা
স্বপ্নে আমার দু - চোখ যেন মুড়িয়ে দিও না
তৎসম শব্দের প্রয়োগ তাঁর কবিতায় অন্য ধরনের শব্দের তুলনায় অনেক বেশী। কারণ যে বাণী যে ভঙ্গিতে তিনি উচ্চারণ করতে চান সেখানে শব্দের স্বাভাবিক অধিকার। প্রাচীন সাহিত্য স্বচ্ছন্দে বিচরণের ফলে কবি সাধারণ বাঙালীর পরিচিত এবং অভ্যস্ত ভাষা প্রাঙ্গণে কিছু অনতিপ্রচলিত আভিধানিক তৎসম শব্দ তুলে আনেন, যেমন ঃ ভুজঙ্গপ্রয়াত, পৌর্ণমাসী, রাতিস্তোম, প্রাবৃট, অনন্তবীজ, শৃঙ্গাটক, বজ্রযান, ইত্যাদি শব্দ ব্যবহার করেন। আবার কবনও নতুন ধারনের তৎসম শব্দ সৃষ্টিও করে নিতে পারেন যেমন ঃ ভ্রূণমঞ্জরি, অক্রান্তা, সৌরকুঞ্জ ইত্যাদি।

কিন্তু পাঠক যেন মনে না করেন অণ বসুর অভিনিবেশ আমাদের প্রাচীন সংস্কৃতির মধ্যেই আবদ্ধ আছে। ঠিকই, তাঁর সৃষ্টির আনন্দ অনেকাংশে সেই প্রাচীন সাংস্কৃতিক উপাদানের সদব্যবহার করে, কিন্তু তিনি এখনকার এই সময়েরই কবি ---সেই সত্য বারবার দৃষ্ট হয় এবং শ্রুত হয় তাঁর কবিতায়। তাই দশমহাবিদ্যা আর শিলালেখা - এর কবিতার পাশেই তিনি লিখতে পারেন কুকুর প্রদর্শনী আর জিরো আওয়ার -এর মত কবিতা এই দিুটি কবিতা তবু একবারে একালের ভাষায় জীবন সম্পর্কে দার্শনিক প্রতীতির দিকেই কবির চলে যাওয়া কিন্তু গৃহহীনদের গান কবিতায় প্রতিবছর বানভাসি হওয়া ভারতের মানুষের নিঃসহয়তা প্রাত্যহিকের সহজ ভাষাতেই কবি লেখেন ----
মৃত্যুর মতো নিয়ে গেছে ঝড়
গত রজনীর গৃহপিঞ্জর

শূন্যের মাঝে চকিতে বলো কে
এঁকে দেবে গৃহ চোখের পলকে

বিশেষ উল্লেখযোগ্য চিত্রাণু অথবা ডুমুর কবিতাটি । জীবনের সেই গভীর অস্তিবিন্দুই এখানেও কবির সন্ধান কিন্তু ভাষায় ফুটে ওঠে প্রাত্যহিকের চেনা পৃথিবী।

আমাদের ছেলেপুলে মাছে -ভাতে, দুধে ও সেমুই-এ
লাল রক্তকরবীর পাশে ফোটা ছোটো ফুল জুঁই -এ
যেন বেঁচে রয় এই পৃথিবীর চেনা, প্রিয় গাছ
যেমন শব্দের হাটে আমিও দেখেছি কুচোমাছ
কিনে আনা আনাজ, ছটফটে - সব্জি, কলাইয়ের বড়ি
টাট্‌কা খুশিমুখ - ছলকুমড়োর আদল, বল্লরি

র রস এবং উজ্জ্বলতা সম্ভবত এতক্ষণে বুঝে নেওয়া গেছে। তিনি তাঁর জীবনব্যাপী অভিজ্ঞতার এবং জীবন - নিবিড় - উপলব্ধির সংমিশ্রনে বিচিত্র ভাষার বিন্যাসে অস্তিত্বের কেন্দ্রীয় - সত্যকে ধবনিত ও চিত্রিত করে তুলতে চান একই সঙ্গে । ছোট্ট একটি ছাড়া আকারের কবিতায় হয়ত তাকে সংহত দর্পণ-বিম্ব -এর মতো বোঝা যাবে

মন্ত্রে জন্মমৃত্যু ঃ ১
উকুর - চুকুর চিচিং ফাঁক
ওয়াং - চোয়াং ফু ঃ,
কিংখাবে জড়ানো জন্ম
কিংখাবে মৃত্যু।

সৃষ্টিসন্ধান
Phone: 98302 43310
email: editor@srishtisandhan.com